জল ভর্তি হয়ে চাষের জমিতে ছড়িয়ে দিত। রাজস্থানের মান্দোরে দশম শতাব্দীর দুটি ভাস্কর্যে এই জাতীয় অরঘট্ট বা ঘটিযন্ত্রের রূপ দেখা যায়। তবে অনেক পণ্ডিত এই সেচ যন্ত্রটিকে 'পার্সিয়ান হুইল' বলে মনে করেন। অধ্যাপক ইরফান হাবিব জানিয়েছেন যে, ভারতের অরঘট্ট এবং পারস্যের চক্র এক নয়। 'পার্সিয়ান হুইল' আরও জটিলতর এক সেচযন্ত্র। পারস্যের চাকায় দুটি অংশ ছিল, দুটি অংশের মধ্যে একটি 'গিয়ার' থাকত। অনুভূমিক চাকাটি ঘুরলে ওপরের চাকাটিও ঘুরত, ঘটি ভর্তি হয়ে জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা সম্ভব হত। ইরফান হাবিবের মতে, এই যন্ত্র তুর্কী অভিযানের আগে ভারতে আসেনি। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে, 'অরঘট্ট' কথাটি গভীর কূপ বোঝাতেও ব্যবহৃত হত। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা চট্টগ্রাম থেকে কামরূপ যাবার (১৩৩৪ খ্রিঃ) পথে চক্রাকার এই যন্ত্রটিতে জল তুলতে দেখেছিলেন। সেচব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ সক্রিয় ছিল। কাশ্মীরে সূর্য যে ব্যাপক সেচপ্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন, তাতে রাজকীয় অনুগ্রহ অবশ্যই ছিল। রাজকীয় উদ্যোগে বড় জলাশয় খননের দৃষ্টান্ত অজানা নয়। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত'-এ বরেন্দ্র অঞ্চলে বিশাল দীঘির কথা উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে চোলরাজারা 'চোল বারিধি' নামে বৃহৎ জলাশয় নির্মাণ করেছেন। তবে আদি মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গঠিত জলসেচ প্রকল্পের বেশি নজীর জানা নেই। আদি মধ্যযুগে ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার একটি বিশেষ চরিত্র দেখা যায়। জলসেচ প্রকল্পগুলির নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্যোগ ও দায়-দায়িত্ব প্রধানত নিত গ্রামসভাগুলি, কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা রাজা নয়। উর বা ব্রাহ্মণদের মহাসভাগুলি জলাশয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ, জলবন্টন, কর আদায় ইত্যাদি কাজ করত। গ্রামসভার অন্তর্ভুক্ত সেচ সমিতির সদস্যরা শ্রমিক নিয়ে জলাশয়গুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করত, কাদামাটি তুলত, জলাশয়ের গভীরতা বাড়াত, জলবন্টনের ক্ষেত্রেও গ্রামসভাগুলির প্রাধান্য ছিল। স্থানীয় সেচব্যবস্থার পরিচালনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এতটা প্রাধান্য দক্ষিণ ভারতে (বিশেষত চোল ভূখণ্ডে) ছাড়া সমকালীন উপমহাদেশের অন্যত্র দেখা যায় নি।

আদি মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা, ৬৫০—১০০০ খ্রিঃ (Feudalism in the Early Medieval Period) ঃ আদি মধ্যযুগে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। মার্কসের ব্যাখ্যায় মধ্যযুগের সমাজ হল সামন্তসমাজ। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামী ডি. এন. ঝা এবং বি. এন. এস. যাদব আদি মধ্যযুগের ভারতে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের কথা বলেছেন, হরবন্স মুখিয়া ও দীনেশচন্দ্র সরকার এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন।

সামন্তপ্রথা সম্পর্কে মতভেদ

ভারতীয় লেখকদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ তত্ত্বটি উল্লেখ করেন। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি,

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নতুন উপাদান দেখা দিতে থাকে। ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে সামন্ত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি তাঁর "অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি" গ্রন্থে বলেছেন যে, দুভাবে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল। খ্রিস্টিয় শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের রাজারা জমি হস্তান্তর করার ফলে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই পর্বের সামন্ততন্ত্রকে ড. কোশাম্বী 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' বলেছেন। গুপ্তযুগে ও হর্ষের সময়কালে এই সামন্ততন্ত্র আরও বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে আর একভাবে 'নিচুতলা থেকে সামন্তব্যবস্থা' গড়ে ওঠেছিল। ভারতের সম্পন্ন কৃষক প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছ থেকে ভূসম্পত্তি কিনে নিয়ে ভূমধ্যধিকারী হয়ে বসেছিল। অবশ্য ড. রামশরণ শর্মা ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে এই দ্বিস্তর ভূমি-সম্পর্ক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি অগ্রহার ব্যবস্থাকেই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান উপাদান বলেছেন।

দ্বিস্তর সামন্ত ব্যবস্থা

সামন্ততন্ত্র বিষয়টি মূলত ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্যান-ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর (৪৭৩ খ্রিঃ) থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কে ইউরোপীয় ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্তপ্রথা। সামন্ত প্রথার মূল বৈশিষ্ট্য কি কি তা নিয়ে যেমন বিতর্কের শেষ নেই, তেমনই এই ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও প্রসার নিয়ে প্রায় সমান মতান্তর বর্তমান। ঐতিহাসিক, সমাজবিদ্যাবিশারদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এক গোষ্ঠী মনে করেন, এই ব্যবস্থা সার্বজনীন লক্ষণযুক্ত; পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই নানা কালেই এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। সামন্তব্যবস্থাকে যে সব পণ্ডিত সার্বজনীন ঘটনা বলে মনে করেন, তাঁদের বিচারে এই ব্যবস্থার প্রধানতম লক্ষণগুলি পশ্চিম ইউরোপে সবচেয়ে প্রকট ছিল। সেই দিক থেকে বিচার করলে সামন্ততন্ত্রের চরিত্র নির্ধারণ করতে হয় মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপের অবস্থা-ব্যবস্থার মাপকাঠিতে। অনেকে আবার মনে করেন, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগের কোন বিশ্বজনীন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। ফলে সমাজব্যবস্থার দেশকাল ভেদে ভিন্নরূপ আছে এবং তাদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলে এই ব্যবস্থার স্বরূপ বোঝা উচিত। সামন্তব্যবস্থার মূল চরিত্র নিয়েও বিতর্ক আছে। মার্ক্সীয় ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামন্ত-ব্যবস্থা উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই মত অনুসারে সামন্ত প্রথায় উৎপাদনের মূল উপকরণ ভূমি। ভূমির ওপর ভূস্বামীদের দখল ও নিয়ন্ত্রণ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম চরিত্র। ভূ-সম্পদ, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন সামগ্রীর ওপর ভূস্বামীরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ভূস্বামীগণ অসংখ্য স্তরে বিভক্ত থাকেন। এই স্তরের সর্বনিম্নে ভূমিদাস বা 'সার্ফ'দের অস্তিত্ব দেখা যায়। ভূমিদাসরা তাদের ভূমিতে আবদ্ধ থাকতেন, জমির ওপর তাঁদের মালিকানা ছিল না। উপরন্তু যখন মালিকানা বদল হত তখন ভূ-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিদাসও হস্তান্তরিত হতেন। রাজস্ব-ব্যবস্থার দ্বারা যত বেশি সম্ভব উদ্বৃত্ত আহরণ ও নিয়মবর্হিভূত অত্যাচারমূলক কর চাপানোর প্রবণতা এই

মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথা ও তার ফল

Scanned by CamScanner

ব্যবস্থায় দেখা যায়। ভূস্বামী ও ভূমিদাসের ভেতর আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক ধনের উৎপাদন কেবলমাত্র তাৎক্ষনিক ভোগের জন্যই হতে থাকে। ফলে বাণিজ্যের সংকোচন ঘটে। পণ্য বিনিময়ের সুযোগ কম থাকায় এক আবদ্ধ অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। এই আবদ্ধ অর্থনীতি এক ধরনের সামাজিক কূপমণ্ডুকতা ও জড়ত্বের শিকার হয়, যা ক্রমাগত সনাতনপন্থী হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে মৃতকল্প অবস্থা বিরাজ করতে থাকে, তা সচরাচর পরিবর্তন ও অভিনবত্বের পরিপন্থী। রাজনীতিতে এক কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিরামিড সামন্ততন্ত্র

অপরপক্ষে, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, সামন্তব্যবস্থা মূলত এক রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা, উৎপাদনভিত্তিক নয়। এই ব্যবস্থা পিরামিডের মত, যার চূড়ায় থাকেন রাজা। কিন্তু রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। রাজা তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা শর্তাধীনে সামন্ত বা অভিজাতদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সামন্তরাজ যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শও দেবেন। এই সামন্তব্যবস্থায় রাজা সামন্তদের ওপর অর্থ ও সৈন্যবলের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকেন। রাজ্যের ভূখণ্ড রাজার কাছ থেকে প্রধান সামন্ত, তার কাছ থেকে মধ্য সামন্ত ও তার কাছ থেকে ক্ষুদ্র সামন্তের মধ্যে বন্টিত হয়। এই সামন্ত ব্যবস্থায় সামন্তদের তার উচ্চতর সামন্তের প্রতি আনুগত্য থাকে, সার্বভৌম রাজার প্রতি নয়। ফলে সামন্ত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির অবনমন ঘটে এবং আঞ্চলিক শক্তির উত্থান অনিবার্য হয়। সামন্ততন্ত্রের এই কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও তার বৈশিষ্ট্য

খ্রিস্টিয় ৬৫০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছরের কালসীমায় ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে। পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর হুবহু মিল নাই। তবে বহুক্ষেত্রেই উভয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। গুপ্তসাম্রাজ্য আনুমানিক ৩১৯—২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৫০ বা ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। সপ্তম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তে কতকগুলি আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠতে থাকে। এই সময়কালে ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিকতার তীব্র প্রভাব ছিল। পরাক্রান্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলি কমবেশি পরিমাণে আঞ্চলিকতার দ্বারাই চিহ্নিত ছিল। বাংলার পাল ও সেন বংশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহারগণ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ও সুদূর দক্ষিণের চোল সাম্রাজ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ শক্তিশালী হলেও এলাকাভিত্তিক শক্তি হিসাবেই তাদের শনাক্ত করা যায়। এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত থাকলেও সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি। ফলে কোন কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই প্রধান শক্তিগুলির অধীনে বহু ক্ষুদ্রতর শাসক গোষ্ঠী ছিল, যারা সাম্রাজ্যগুলির

আধিপত্য মানলেও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে তৎপর ছিল। এই অধীনস্থ শক্তিগুলির পারস্পরিক ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর কথা জানা যায়। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ সহজ হয়। বলা চলে যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের অভাব সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলিকে জোরদার করে এবং সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির দৃঢ়ভিত্তি আঞ্চলিকতাবাদকে শক্তিশালী করে। তবে পশ্চিম ইউরোপের 'ভূমিদাস ব্যবস্থা'র প্রতিরূপ ভারতে ছিল না। ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। তবে তারা কেউই ইউরোপীয় ভূমিদাসের মত পাকাপাকিভাবে জমিতে আবদ্ধ ছিলেন না। ভারতের কৃষক ইউরোপের মধ্যযুগীয় ভূমিদাসের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। অবশ্য কৃষকদের ওপর দমন-পীড়ন কিছু কম ছিল না।

অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে সামন্ততন্ত্র

ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব এবং ডি. এন. ঝা ভারতের সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বগত কাঠামোটি নির্মাণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, তাম্রশাসন জারী করে নিষ্কর-ভূসম্পদ দানের মাধ্যমে ভারতীয় সামন্ত ব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রহার দানে এই রীতি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমশ তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। জমি ব্রাহ্মণ ছাড়াও মন্দির, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দান করার ঝোঁক বাড়তে থাকে। দান গ্রহীতারা প্রথম পর্যায়ে পুরোহিত বা ধর্মজগতের মানুষ হলেও তাম্রশাসনের দ্বারা ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব হস্তান্তর করার ঘটনা পরবর্তীকালে ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হতে থাকে। লৌকিক উদ্দেশ্যে রাজস্ব দানের নীতি চালু হলে, ড. শর্মার বিচারে, তা সামন্তপ্রথাকে বিশেষভাবে সবল করে তোলে। ড. রামশরণ শর্মার মতে, ৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যের সময়-সীমায় ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে। ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ এবং ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সামন্ত ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি ও ভাঙ্গন ঘটে।

ভারতে প্রভাবশালী সামন্ত শ্রেণির উদ্ভব সম্পর্কে ড. শর্মার অভিমত

ড. শর্মা ও তাঁর অনুগামীদের মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রভাবশালী সামন্ত শ্রেণির উদ্ভব। এই সামন্তরাই ছিল প্রকৃত ভূস্বামী, অভিজাত। অগ্রহার ব্যবস্থার নিষ্কর ভূমিদানের ফলে এই শ্রেণির আর্বিভাব ঘটে। এরা ছিল রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। জমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধি, মধ্যস্বত্বভোগী ভূ-স্বামীদের আবির্ভাব কৃষকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও রাজকীয় রাজস্বে ভাগ বসাতে থাকে। ড. শর্মার অনুমান এই যে, সামন্তপ্রথার উদ্ভব ও উত্থান এক বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিচয় ড. শর্মা পুরাণে বর্ণিত কলিযুগের বিবরণের মধ্যে সন্ধান করেছেন। গুপ্ত আমলে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে প্রধান পুরাণগুলির সংকলন ঘটেছিল। পুরাণগুলিতে চারটি যুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) যে যুগবৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে তার মধ্যে শেষতম

Scanned by CamScanner

কলিযুগ নিকৃষ্ট বলে বর্ণিত। শেষতম যুগের বর্ণনাটি সম্ভবত পুরাণকারদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলে ড. শর্মা অভিমত দিয়েছেন। দ্বাপর যুগের শেষ ও কলিযুগের শুরু যখন ঘটছে সেই যুগান্তরের লক্ষণগুলি পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। কলিযুগের আবির্ভাবকে পৌরাণিক সাহিত্যে সার্বিক সংকটের কাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময়ে দণ্ডের অভাব, বর্ণাশ্রমে বিপর্যয়, বহিরাক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজস্ব সংগ্রহে বাধা, রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাসের উল্লেখ পুরাণের বর্ণনায় আছে। পুরাণের এই বর্ণনায় ঐতিহাসিক সত্যতা হয়তো নেই কিন্তু পুরাণে বর্ণিত সার্বিক সংকটের যে ধারণাটি দেখা যায় তার প্রতি ড. শর্মা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুরাণে কলিযুগকে যেভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের অস্থিরতার কাল বলা হয়েছে, তাতে সামন্তব্যবস্থার আগমনবার্তা শোনা যায় বলে ড. শর্মা মনে করেন। ড. শর্মা কলিযুগের সংকটজনক পরিস্থিতিতেই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশকে স্থাপন করেছেন। অগ্রহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রদত্ত ভূখণ্ড বা গ্রামের ওপর দান গ্রহীতাদের এক ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে। ড. শর্মা দেখিয়েছেন যে, দান গ্রহীতারা কার্যত ভূস্বামীতে পরিণত হন। তাঁরা কেবলমাত্র ভূসম্পদ ও গ্রাম থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ভোগ করতেন না, রাজস্ব আদায় ও আঞ্চলিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বজায় রাখার অধিকারও তাঁদের ছিল। ড. শর্মা মনে করেন, এর ফলে সম্ভবত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা খণ্ডিত হয় ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বেড়ে যায়। ড. শর্মা কলিযুগের বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেন যে, শাসকদের পক্ষে রাজস্ব আদায় তখন সম্ভব হত না বলেই, সম্ভবত ভূস্বামীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল।

গুপ্ত ও বাকাটক শাসনকালে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যেও বৌদ্ধ বিহারের জন্য অগ্রহার সৃষ্টি করার যে ঝোঁক দেখা যায়, ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আদি-মধ্যযুগে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। আদি মধ্যযুগের ভূমিদান পত্র স্বরূপ তাম্রশাসনগুলি বিচার করলে দেখা যায়, এই সময় বৈষ্ণব ও জৈন মন্দিরগুলির উদ্দেশ্যে বহু ভূসম্পদ দান করা হয়েছিল। এর ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভূমধ্যধিকারীর চরিত্র লাভ করে এবং বিপুল ভূ-সম্পদের অধিকারী হয়। এ সম্পর্কে পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নালন্দা মহাবিহারের উল্লেখ করা যায়। পাল পূর্ববর্তী আমলে নালন্দা মহাবিহারের ব্যয় নির্বাহ অগ্রহার ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ২০৯ টি গ্রাম থেকে হত। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, যবদ্বীপের রাজা শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদের দেবপালের অনুমতিক্রমে এই বিহারের উদ্দেশ্যে আরও ৫টি গ্রাম দান করেন। ২১৪টি গ্রামের রাজস্ব ভোগের অধিকার পেয়ে নালন্দা মহাবিহার ভূম্যধিকারীর রূপ ধারণ করেছিল। বাংলার চন্দ্র, বর্মণ, দেব প্রভৃতি রাজবংশ সমতট-হরিকেল—বঙ্গাল অঞ্চলে ময়নামতী বিহারের উদ্দেশ্যেও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। পালদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, এ সময় বহু ব্রাহ্মণকে অগ্রহার ব্যবস্থায় ভূসম্পদ দান

বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলির ভূম্যধিকারীতে পরিণতি লাভ

করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের জমি ও গ্রাম দানের ঝোঁক একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বাংলায় বিশেষত সেন বংশের শাসনাধীন অঞ্চলে আরও বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ সেন আমলের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মার বহু সম্পত্তি ছিল। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, হলায়ুধ শর্মা ৩৩৯ ½ উন্মান বা উয়ান পরিমাণ জমি পেয়েছিলেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রতিহার শাসকেরা অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের নজির নেই। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজারা ব্যাপকভাবে ভূমিদান করেন। একজন রাষ্ট্রকূট রাজা ১৪০০ গ্রাম দান করেন। দক্ষিণ ভারতে 'ব্রহ্মদেয়' (ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি) ও 'দেবদান' (মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি) প্রথার প্রচুর নজির অসংখ্য লেখমালায় ছড়িয়ে আছে। গোয়া অঞ্চলের কদম্ব বংশীয় রাজাদের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, পতিত বনভূমিকে চাষযোগ্য এলাকায় (অরণ্যকর্ষন) পরিণত করার জন্য এক ব্রাহ্মণকে ভূসম্পদ দান করা হয়েছিল। একই ধরনের ইঙ্গিত মেলে গোরিবিডনুর তালুক থেকে প্রাপ্ত ৭৬২ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ থেকে। মন্দিরগুলি ভূসম্পদে এতই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দিরগুলি শুধু ভূস্বামীই নয়, সেগুলি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্রাহ্মণ যিনিই অগ্রহার ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করুন, এর দুটি প্রধান অভিঘাত অর্থনৈতিক জীবনে দেখা যায় —(১) ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ও (২) ভূস্বামী ও ভূম্যধিকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। ভূম্যধিকারীদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কৃষকের মর্যাদা কমে যায়। ভূমিব্যবস্থায় জটিলতা বাড়ে। মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে, ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যবর্তীস্তরে মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। কারিগর ও নানা বৃত্তিধারীরা মন্দির কিংবা সামন্ত প্রভুর অধীনতায় থাকে। বাণিজ্যের সংকোচন ঘটে।

ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন, কৃষকের অবস্থান (Changes in land tenure, Peasants) : আদি-মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের উপাদান-স্বরূপ নানা ধর্মশাস্ত্রে বিস্তর ভূমিব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় —(১) মহীপতি (রাজা), (২) স্বামী (জমির মালিক), (৩) কর্ষক (প্রকৃত চাষি)। জমির মালিক ভূস্বামী জমি নিজে চাষ করতেন না। এজন্য তাঁকে কৃষক নিয়োগ করতে হত। বৃহৎ ভূ-স্বামীদের উত্থানের ফলে মালিকানাহীন কৃষি শ্রমিকের উদ্ভব হয়েছিল। বৃহৎ ভূস্বামী এদের নিয়োগ করে কৃষি উৎপাদনের কাজ চালাতেন। অধ্যাপক শর্মা সমতট অঞ্চলের রাজা দেবখড্গের আসরাফপুর তাম্রশাসনের (৬৭৫ খ্রিঃ) ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, ভূমিদান সংক্রান্ত আদেশনামায় মালিকানা ছাড়াও ভোগাধিকারী (ভুজ্যমানক) ও কৃষক (কৃষ্যমানক)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে দেখা যায় যে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা ছাড়াও ভোগাধিকারের ধারণা ছিল, যে ভোগাধিকার মালিকানা থেকে

ভোগাধিকারী ও কৃষক সম্প্রদায়

Scanned by CamScanner